জগৎ শেঠদের নিজের দলে টানতে চেয়েছিল। মির জাফর নিজেও জগৎ শেঠদের পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন। ফলে পলাশির যুদ্ধের পর জগৎ শেঠদের সম্মতিতে ব্রিটিশ কোম্পানি মির জাফরকেই নবাব নির্বাচিত করে।

১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে যখন মুর্শিদকুলি মারা যান, তখনও মুঘলদের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ভালো ছিল। মুর্শিদকুলির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে গোলযোগ বাধে। সেই পরিস্থিতিতে জগৎ শেঠ ও কয়েকজন ক্ষমতাবান জমিদারের মদতে সেনাপতি আলিবর্দি খান সুবা বাংলার ক্ষমতা দখল করেন।

বাস্তবে আলিবর্দি খানের শাসনকালে মুঘলদের হাত থেকে সুবা বাংলার অধিকার বেরিয়ে যায়।

শাসনতান্ত্রিক কোনো খবরাখবরই দিল্লির মুঘল সম্রাটকে জানানো হতো না। তাছাড়া নিয়মিত রাজস্ব পাঠানোর ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়। যদিও মুঘল কর্তৃত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হতো, তবুও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় আলিবর্দি কার্যত একটি স্বশাসিত প্রশাসন চালাতেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দি মারা যান। তাঁর দৌহিত্র সিরাজ উদ-দৌলা নতুন নবাব হন। কিন্তু দ্রুতই দরবারের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে সিরাজের সংঘাত বাঁধে। তার পরিণতিতে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ কোম্পানির কর্তৃত্ব তৈরি হয়েছিল।

টুকরো কথা

বাংলায় বর্গিহানা

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল, বর্গি এল দেশে—ছড়াটি প্রায় সবারই জানা। বাংলায় মারাঠা বা বর্গি আক্রমণ ছিল নবাব আলিবর্দির সময় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মারাঠারা বাংলা ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠতরাজ ও আক্রমণ চালিয়ে ছিল। সেই আক্রমণের স্মৃতি নানা ছড়া ও প্রবাদে বর্গিহানা বলে পরিচিত হয়েছে।

বর্গিহানায় ভুক্তভোগী বাঙগালি কবি গঙগারাম বর্গিদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন— "**যেই মাত্র পুনরপি ভাস্কর আইল।/তবে সরদার সকলে ডাকিয়া কহিল—/'স্ত্রীপুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।/তলয়ার খুলিয়া সব তাদের কাটিবা।।'/**

এতেক বচন যদি বলিল সরদার।/চতুর্দ্দিকে লুটে কাটে বোলে 'মার মার'।। "

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক লুঠতরাজ চালায় বর্গিরা। নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদও বর্গি আক্রমণের হাত থেকে বাদ যায়নি। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির একটি শর্তে বলা হয় উড়িষ্যার জলেশ্বরের কাছে সুবর্ণরেখা নদী সুবা বাংলার সীমানা। মারাঠারা সেই সীমানা ভবিষ্যতে পার করবে না। মারাঠা হানার ফলে বাংলার পশ্চিমপ্রান্ত ছেড়ে অসংখ্য মানুষ পূর্ব, উত্তর বাংলা এবং কলকাতায় চলে যায়। কলকাতায় অনেকে ব্রিটিশ বণিকদের আশ্রয় পেয়েছিল। নবাবের বিকল্প হিসেবে ব্রিটিশ কোম্পানি হয়ে উঠেছিল

'রক্ষাকারী'। বর্গিহানা আটকাবার জন্য কলকাতায় খাল খোঁড়া হয়েছিল। তাকে মারাঠাখাল বলা হতো। কলকাতার ব্রিটিশ-কুঠির চিঠিপত্রে তার বর্ণনা রয়েছে:

"কলিকাতা কাসিমবাজার ও পাটনায় আমাদের (ব্রিটিশ) কারবার কিছুদিনের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। .... কলিকাতায় এক শত বকসরিয়া সৈন্য নিযুক্ত করা হইল, এবং .... স্থানীয় সাহেবদের লইয়া এক মিলিশিয়া গঠন করা হইল।.... কলিকাতার বণিকগণ প্রস্তাব করিল যে তাহাদের বাড়ীঘর রক্ষা করিবার জন্য তাহারা নিজের খরচে সহর ঘিরিয়া একটা খাল খুঁড়িবে। আমাদের কৌউন্সিল.... এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া চার জন প্রধান লোকের জামিনে তিন মাসে শোধ

দিবার সর্ত্তে ২৫,০০০ টাকা ধার দিল। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৭৪৪এর মধ্যে ঐ খাল ('মারাঠা ডিচ') ফোর্টের দরওয়াজা হইতে হ্রদ (সল্টলেক)এর দিকে যাইবার বড় রাস্তা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন গোবিন্দপুরে কোম্পানীর সীমানা পর্য্যন্ত তাহা লইয়া যাইবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।"

[গঙ্গারাম-লিখিত মহারাষ্ট্র-পুরাণ-এর অংশ ও ব্রিটিশ-কুঠির চিঠির উদ্ধৃত অংশগুলি যদুনাথ সরকার-এর 'বর্গীর হাঙ্গামা' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে (মূল বানান অপরিবর্তিত)। ব্রিটিশ-কুঠির চিঠিতে যে ফোর্ট-এর কথা রয়েছে, সেটি এখনকার কলকাতার জেনারেল পোস্ট অফিসের জায়গায় ছিল।]

হায়দরাবাদ

মির কামার উদ-দিন খান সিদ্দিকি চিন কুলিচ খান

নিজাম-উল-মুলক

মুঘল দরবারে একজন শক্তিশালী অভিজাত ছিলেন মির কামার উদ-দিন খান সিদ্দিকি। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁকে চিন কুলিচ খান উপাধি দেন। পরে তিনি সম্রাট ফাররুখশিয়রের থেকে নিজাম-উল-মুলক এবং সম্রাট মহম্মদ শাহের থেকে আসফ ঝা উপাধি নিয়ে ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে হায়দরাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মুঘল প্রাদেশিক শাসক মুবারিজ খান হায়দরাবাদে প্রায় স্বাধীন শাসকের মতো ছিলেন।

১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে আসফ ঝা মুবারিজ খানকে হারিয়ে দেন এবং পরের বছর নিজেই দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়ে হায়দরাবাদ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে স্থায়ীভাবেই হায়দরাবাদে থেকে প্রশাসন চালাতে থাকে নিজাম। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই নিজামের শাসনে স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল কর্তৃত্বকে হায়দরাবাদ অস্বীকার করেনি। মুঘল সম্রাটের নামেই হায়দরাবাদের মুদ্রাগুলি চলত। এমনকি সম্রাটের নামে খুতবাও পাঠ করা হতো। তবে বাস্তবে প্রশাসনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিজাম স্বাধীনভাবেই চালাতেন। মুঘল সম্রাটের কাছে কোনো খবরাখবর পৌঁছোত না।

হায়দরাবাদি প্রশাসনে আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল কাঠামো বজায় থাকলেও, ভিতরে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। যেমন জায়গিরগুলি ক্রমে বংশগত হয়ে গিয়েছিল। প্রশাসনে অনেক নতুন লোক যুক্ত হয়েছিল। বস্তুত হায়দরাবাদে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছিল।

অযোধ্যা

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে সাদাৎ খানের নেতৃত্বে অযোধ্যা একটি স্বশাসিত আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। মুঘল প্রশাসক হিসেবে সাদাৎ খানের দায়িত্ব ছিল অযোধ্যার স্থানীয় রাজা ও গোষ্ঠীর নেতাদের বিদ্রোহের মোকাবিলা করা। দ্রুতই সেই কাজে সফল হওয়ার জন্য মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ সাদাৎ খানকে বুরহান-উল মুলক উপাধি দেন। মুঘল

সম্রাটকে দিয়ে নিজের জামাই সফদর জং-কে অযোধ্যার প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করান সাদাৎ খান। পাশাপাশি অযোধ্যার দেওয়ানের দফতরকে দিল্লির নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে ফেলেন তিনি। অযোধ্যার রাজস্ব বিষয়ক কোনো খবরাখবরই মুঘল কোশাগারে পাঠানো হতো না।

সফদর জং

সাদাৎ খান জায়গিরদারি ব্যবস্থাতে আঞ্চলিক অনভিজাত লোকেদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন। অযোধ্যা অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্য খুবই উন্নত ছিল। সাদাৎ খানের সমর্থক এক নতুন শাসকগোষ্ঠী তৈরি

হয় অযোধ্যায়। তাদের মধ্যে ভারতীয় মুসলমান, আফগান ও হিন্দুরা ছিল সংখ্যায় বেশি। তবে মুঘল দরবারের সঙ্গে অযোধ্যার সম্পর্ক সাদাৎ খান শেষ করে দেননি। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে সাদাৎ খান মারা যান। ততদিনে অযোধ্যায় প্রায় স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ত কিছুতেই মুঘল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হতো।

১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে সফদর জং মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে সুজা উদ-দৌলা অযোধ্যার শাসক হন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের আগে প্রায় দশ বছর অযোধ্যা অঞ্চলে সুজার কর্তৃত্ব ছিল চূড়ান্ত।

বাংলার নবাব ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্কের বিবর্তন

মুর্শিদকুলি খানের সময় বাংলায় বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক ও বাণিজ্য কোম্পানি ব্যবসা করত। সেগুলির মধ্যে ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসি কোম্পানি তিনটি ছিল বেশি ক্ষমতাশালী। তাদের মধ্যে আবার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজিক উদ্যোগ ছিল সব থেকে বেশি। নবাব হিসেবে মুর্শিদকুলি খান বিদেশি বণিকদের সঙ্গে সচরাচর বিরোধিতায় যেতেন না। কিন্তু নিজের অধিকার ও কর্তৃত্ব যাতে কোনোভাবে বিদেশি কোম্পানির দ্বারা ক্ষুণ্ণ না হয়, সে বিষয়ে নবাব সচেতন ছিলেন। বাস্তবে মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে

ব্রিটিশ কোম্পানির সম্পর্ক প্রভাবিত হয়েছিল ফাররুখশিয়রের ফরমান দ্বারা।

টুকরো কথা

ফাররুখশিয়রের ফরমান

১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির মুঘল সম্রাট ফাররুখশিয়র একটি আদেশ বা ফরমান জারি করেছিলেন। সেই ফরমান মোতাবেক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলাদেশে কতগুলি বিশেষ বাণিজ্যিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল। যেমন, ব্রিটিশ কোম্পানি বছরে মাত্র ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্য করতে পারবে। কিন্তু তার জন্য কোম্পানিকে কোনো শুল্ক দিতে হবে না। ব্রিটিশ কোম্পানি কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে ৩৮ টি গ্রামের জমিদারি কিনতে পারবে। কোম্পানির পণ্য কেউ চুরি করলে তাকে বাংলার

নবাব শাস্তি দেবেন ও কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দেবেন। কোম্পানির জাহাজের সঙ্গে অনুমতি পত্র থাকলেই সেই জাহাজ অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে। তাছাড়া বাংলার নবাবের মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল প্রয়োজন মতো কোম্পানি ব্যবহার করতে পারবে।

লন্ডনের ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস। মূল ছবিটি জোসেফ হসমার শেফার্ড-এর আঁকা (১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ)।

ফাররুখশিয়রের ফরমান বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রায় অবাধ বাণিজ্যের পথ খুলে দিয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে বাংলার নবাবের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের পটভূমি তৈরি করেছিল ঐ ফরমান।

মুঘল সম্রাট ফাররুখশিয়র

সুবা বাংলায় প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করলেও, মুর্শিদকুলি খান মুঘল সম্রাটের অধীন ছিলেন। ফলে কোম্পানিকে দেওয়া ফররুখশিয়রের ফরমান সরাসরি নাকচ করার অধিকার তার ছিল না। কিন্তু ঐ ফরমান ব্যবহারের ফলে ব্রিটিশ কোম্পানির

বাড়তি বাণিজ্যিক সুবিধার প্রসঙ্গটি মুর্শিদকুলির পছন্দও ছিল না। ফলে গোড়া থেকেই ফরমান-প্রদত্ত কোম্পানির অধিকারকে তিনি সীমিত করতে চেয়েছিলেন। মুর্শিদকুলি ঘোষণা করেন যেসব বাণিজ্য দ্রব্য সরাসরি সমুদ্র পথে আমদানি-রফতানি হবে কেবল সেগুলির শুল্কই মকুব হবে। কিন্তু দেশের ভিতরে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় নীতি প্রযোজ্য হবে না। ব্রিটিশদের কলকাতা সংলগ্ন গ্রাম কেনার ব্যাপারেও মুর্শিদকুলির অমত ছিল। তাছাড়া মুর্শির্দাবাদের টাঁকশাল ব্যবহারের সুবিধাও তিনি কোম্পানিকে দেননি।

ফাররুখশিয়রের ফরমানে বলা ছিল কেবল ব্রিটিশ কোম্পানি পণ্যের উপর শুল্ক ছাড় পাবে। অথচ কোম্পানির বণিকরা ব্যক্তিগত ব্যবসাতেও দস্তকের অপব্যবহার করে নবাবের শুল্ক ফাঁকি দিতে থাকে। সে বিষয়কে কেন্দ্র করে মুর্শিদকুলির সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির সম্পর্ক নষ্ট হয়েছিল। তাছাড়া নবাবের অনেক কর্মচারীও ব্রিটিশ বণিকদের থেকে নানা অজুহাতে টাকা পয়সা দাবি করত। এমন কি সেই দাবি না মেটালে ব্রিটিশ কর্মচারীদের উপর মাঝেমধ্যে অত্যাচার করত নবাবের কিছু কর্মচারী। তেমনি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবাবের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধিতা দেখা দেয়। শেষ

পর্যন্ত জগৎ শেঠদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটে যায়। কিন্তু বাংলার নবাব ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত সেখানেই হয়েছিল।

মুর্শিদকুলির মতো আলিবর্দি খানও বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিলেন। তিনিও মনে করতেন বাংলার অর্থনীতি এর ফলে সমৃদ্ধ হবে। তবে বিদেশি বণিক ও কোম্পানিগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা কোনোভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। আলিবর্দি খেয়াল রাখতেন যাতে ঐ বণিকেরা কেবল ব্যবসায়ী

বাংলার নবাব আলিবর্দি খান

হিসেবে বাংলায় থাকে। নবাবের সার্বভৌম ক্ষমতার বিরোধী হিসেবে বিদেশি বণিক কোম্পানির উত্থান যাতে না হয়, তার জন্য আলিবর্দি সজাগ থাকতেন। পাশাপাশি বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বাহক ব্রিটিশ বণিকদের যাতে কোনো জুলুমের মুখে না পড়তে হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতেন নবাব। বস্তুত বিদেশি বণিকদের বাংলা থেকে হটিয়ে দেওয়ার চিন্তা আলিবর্দি খানের ছিল না।

তবে বিদেশি বণিকদের বাণিজ্যের বিষয়ে উৎসাহ দেখালেও, বণিক কোম্পানিগুলি যাতে নিজেদের মধ্যে বিবাদ না করে, সে বিষয়ে আলিবর্দির কড়া

নজর ছিল। তার ফলে বাংলায় ব্রিটিশ ও ফরাসি কোম্পানির মধ্যে সরাসরি সংঘাত বাঁধেনি। ঐ দুই কোম্পানিকেই বাংলায় দুর্গ তৈরি করতে বাধা দিয়েছিলেন আলিবর্দি। তাঁর যুক্তি ছিল বণিকদের দুর্গের কী প্রয়োজন? তাছাড়া তাদের নিরাপত্তার জন্য নবাব নিজেই উদ্যোগী ছিলেন। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা আক্রমণের সময়ে আলিবর্দি খান ব্রিটিশ কোম্পানির থেকে ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। সেই টাকা দিতে কোম্পানি অস্বীকার করে। তাই নিয়ে নবাবের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির

নিজে করো

৩২ পৃষ্ঠার মানচিত্রটির মতো একটি মানচিত্র আঁকো। তাতে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের আঞ্চলিক শক্তিগুলির অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করো।

সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল। পরে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি আর্মেনীয় বণিকদের জাহাজ আটকে রাখার ফলে আলিবর্দির সঙ্গে কোম্পানির সংঘাত বাঁধে। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ভয় দেখিয়ে আর্মেনীয় জাহাজগুলি রক্ষা করেন আলিবর্দি।

সিরাজ উদ-দৌলা ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক : পলাশির যুদ্ধ

আলিবর্দির উত্তরাধিকারী হিসেবে সিরাজ উদ-দৌলার ক্ষমতা লাভ অনেককেই অসন্তুষ্ট করেছিল। সিরাজের আত্মীয়দের অনেকেই এবং আলিবর্দি খানের বক্সি বা সেনাপতি মির

জাফরও সিরাজের বিপক্ষে ছিলেন। তার পাশাপাশি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গেও সিরাজের সম্পর্ক গোড়া থেকেই ভালো ছিল না। নবাব হওয়ার কিছু দিন পরেই একের পর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিরাজের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধ তৈরি হয়।

টুকরো কথা

সিরাজের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের কারণ: খোজা ওয়াজিদকে লেখা চিঠি

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন সিরাজ মুর্শিদাবাদ থেকে আর্মেনীয় বণিক খোজা ওয়াজিদকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে সিরাজ ব্রিটিশদের সম্পর্কে তাঁর নেতিবাচক

মনোভাবের কারণ ব্যক্ত করেছিলেন। চিঠিটিতে লেখা ছিল:

"ইংরাজ তাড়াইব। আমার রাজ্য হইতে ইংরাজ তাড়াইবার তিনটি যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য আছে। (১) প্রথম কারণ এই যে,— উহারা সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে ; সুবৃহৎ পরিখা খনন করিয়াছে; তাহা বাদশাহী সাম্রাজ্যের চির-প্রচলিত আইন কানুনের সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানাবলীর বিপরীত কার্য। (২) দ্বিতীয় কারণ,— কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য "দস্তক" নামক যে পরোয়ানা পাইবার অধিকারী, উহারা তাহার অপব্যবহার করিয়া, অনধিকারীকে "দস্তকের" ফললাভ করিতে দিয়া বাদশাহী শুল্কের ক্ষতি করিতেছে। (৩) তৃতীয় কারণ,--- যে সকল বাদশাহী কর্মচারী কৃতকার্যের নিকাশ দিবার

বাংলার নবাব সিরাজ উদ-দৌলা

দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের মতলব করে, উহারা তাহাদিগকে নিজ অধিকার মধ্যে আশ্রয় দিয়া, ন্যায় বিচারের বাধা প্রদান করিতেছে।”

সিরাজ ঐ চিঠিতে আরও লিখেছিলেন:

“এই সকল কারণে, ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিবারই প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। তবে যদি ইহারা এই সকল অন্যায় আচরণ দূর করিবার জন্য অঙ্গীকার করে এবং নবাব জাফর খাঁর (মুরশিদকুলি খাঁর) আমলে অন্যান্য বণিক যে নিয়মে বাণিজ্য করিত, সেই নিয়মে বাণিজ্য করিতে সম্মত হয়, ক্ষমা করিব, দেশেও থাকিত দিব। অন্যথা শীঘ্রই ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিব।”

[সিরাজের চিঠির উদ্ধৃত অংশগুলি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থের ‘কলিকাতা অবরোধ’ অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে (মূল বানান অপরিবর্তিত)।]

শেষপর্যন্ত নবাবের সেনাবাহিনী কলকাতার কাশিমবাজারের ব্রিটিশ কুঠি আক্রমণ করে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন নবাব-বাহিনী ব্রিটিশদের হারিয়ে কলকাতা দখল করে। রজার ড্রেক ও তার সহযোগীরা কলকাতার দক্ষিণে ফলতায় পালিয়ে যান। কলকাতা দখল করে সিরাজ তার নাম দেন আলিনগর। কোম্পানির কর্তাব্যক্তি হলওয়েল প্রচার করেছিলেন যে কলকাতা দখল করে সিরাজ নাকি ১৪৬ জন ব্রিটিশ নরনারীকে একটি ছোটো ঘরে বন্দি করে রেখেছিলেন। তার ফলে অনেক বন্দি মারা যায়। এই ঘটনাকে 'অন্ধকূপ হত্যা' বলা হয়। যদিও এই ঘটনা আদৌ ঘটেছিল কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'অন্ধকূপ হত্যা'কে অতিরঞ্জন বলে প্রমাণ করেছিলেন।

টুকরো কথা

অন্ধকূপ হত্যা

‘‘যাঁহারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্মপীড়িত হইয়া অন্ধকূপ-কারাগারে জীবনবিসর্জন করিলেন, তাঁহাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয় সমসাময়িক ইংরাজদিগের কাগজপত্রে অন্ধকূপ-হত্যার নাম পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

হলওয়েল মনুমেন্ট। মূল রঙিন ছবিটি জেমস বেইলি ফ্রেজার-এর আঁকা (১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ)

রণপলায়িত ইংরাজবীরপুরুষগণ পল্‌তার বন্দরে বসিয়া দিন দিন যে সকল গুপ্তমন্ত্রণা করিতেন, তাহার বিবরণ-পুস্তকের কোন স্থানেই অন্ধকূপ-হত্যার

উল্লেখ নাই। .... মাদ্রাজের ইংরাজদরবারের অনুরোধ রক্ষার্থে দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকটের নবাব বাহাদুর সিরাজদ্দৌলাকে যে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,তাহার মধ্যে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। .... ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ বঙগদেশে শুভাগমন করিয়া পলাশিযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্য্যন্ত সিরাজদ্দৌলাকে যত সুতীব্র সামরিক লিপি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই! সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদিগের যে আলিনগরের সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহার মধ্যেও অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই।

.....

অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী কবে কাহার কৃপায় জনসমাজে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল,---সে

ইতিহাসও সবিশেষ রহস্য-পরিপূর্ণ! হলওয়েল সাহেব তাহার প্রথম প্রচারক।

.....

হলওয়েল যে কারাগৃহের বর্ণনা করিয়া গিয়াছিল, তাহা ১৮ ফিট দীর্ঘ এবং ১৮ ফিট প্রস্থ। এরূপ ক্ষুদ্রায়তন সংকীর্ণকক্ষে ১৪৬ জন নরনারী কিরূপে কারারুদ্ধ হইতে পারে, সে কথা কিন্তু অল্পলোকেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন! এক একজন মানুষের জন্য অন্ততঃ ৬ ফিট দীর্ঘ, ২ ফিট প্রস্থ এবং ২ফিট বেধসমন্বিত স্থানের আবশ্যক হইলে, ওরূপ সংকীর্ণকক্ষে ৮১ জনের অধিক লোকের কিছুতেই স্থানসংকুলান হইতে পারে না। অথচ তাহারই মধ্যে ১৪৬ জন নরনারী

কেমন করিয়া স্থানলাভ করিয়াছিল? অল্পায়তন গৃহকোটরে নিদারুণ গ্রীষ্মকালে ১৪৬ জন নরনারীকে কারারুদ্ধ করাই অন্ধকূপ-হত্যার সর্বপ্রধান কলঙ্ক;— সে কলঙ্ক কি নিতান্ত অতিরঞ্জিত বা সর্বথা কাল্পনিক কলঙ্ক নহে? অথচ জ্ঞানগর্বিত বৃটিশজাতি ইহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, সাশ্রুনয়নে হলওয়েলের কল্পিত কাহিনী গলাধঃকরণ করিয়া, আজিও কত না হা হুতাশ করিতেছেন!”

[অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র ‘অন্ধকূপ-হত্যা— রহস্যনির্ণয়’ প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতাংশটি নেওয়া হয়েছে (মূল বানান অপরিবর্তিত)।]

যদিও কলকাতায় সিরাজের অধিকার বেশি দিন টেকেনি। দ্রুতই রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ বাহিনী ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা আবার দখল করে নেয়। ফলে ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে বাংলারা নবাব সন্ধি করতে বাধ্য হন। আলিনগরের সন্ধির ফলে ব্রিটিশ কোম্পানি তার বাণিজ্যিক অধিকারগুলি ফিরে পায়। নবাব ব্রিটিশ কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দেন। তাছাড়া কলকাতায় নিজের দুর্গ তৈরি করা শুরু করে ব্রিটিশ কোম্পানি। এমনকি নিজেদের সিক্কা (মুদ্রা) তৈরি করার ক্ষমতাও তারা পায়। বাস্তবে আলিনগরের সন্ধি বাংলার নবাবের পক্ষে অসম্মানের ও ব্রিটিশ কোম্পানির পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল। ক্রমেই ব্রিটিশ কোম্পানির

সিরাজ-বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে সিরাজ উদ-দৌলার সঙ্গে বিভিন্ন পক্ষের বিবাদ স্পষ্ট হয়েছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে ব্রিটিশ কোম্পানির বাহিনী নবাবের বাহিনীকে হারিয়ে দেয়। মির জাফর সেই যুদ্ধে মূলত নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

টুকরো কথা

নবাব মির জাফর ও পলাশির লুণ্ঠন

পলাশির যুদ্ধের পরে রবার্ট ক্লাইভ মির জাফরকে বাংলার নবাব হিসেবে নির্বাচন করেন। তার বিনিময়ে মির জাফরের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির কতগুলি চুক্তি হয়েছিল। সেইসব চুক্তি মোতাবেক

বাংলায় ব্রিটিশ কোম্পানির অবাধ বাণিজ্য চালু হয়। পাশাপাশি টাকা তৈরির অধিকারও কোম্পানি লাভ করে। ২৪ পরগনা জেলার জমিদারি ও সেখান থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব দিয়ে সামরিক খরচ মেটানোর অধিকার কোম্পানিকে দেওয়া হয়। তাছাড়া মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়। কলকাতার উপরে নবাবের যাবতীয় অধিকার নস্যাৎ হয়ে যায়।

পলাশির যুদ্ধের পর রবার্ট ক্লাইভ ও মির জাফরের সাক্ষাৎ। মূল রঙিন

বস্তুত নবাব মির জাফরকে সহায়তা করার বিনিময়ে ব্রিটিশ কোম্পানি অবাধে সম্পদ হস্তগত করতে থাকে। পলাশির যুদ্ধের পর সিরাজের কলকাতা আক্রমণের অজুহাতে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ নেয় কোম্পানি। তার উপরে ক্লাইভ সহ কোম্পানির উঁচু পদাধিকারীরা মির জাফরের থেকে প্রচুর সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছিলেন। সব মিলিয়ে পলাশির যুদ্ধের পরে পরে প্রায় ৩ কোটি টাকার সম্পদ মির জাফরের থেকে আদায় করে ব্রিটিশ কোম্পানি। কোম্পানির তরফে এই অর্থ আত্মসাৎকে পলাশির লুণ্ঠন বলা হয়। স্বাভাবিকভাবেই নবাবের কোশাগার এই লুণ্ঠনের ফলে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে রবার্ট ক্লাইভ ইংলন্ডে ফিরে যান। সেইসময় ব্রিটিশ কোম্পানির অনেক কর্তাব্যক্তি মির জাফরকে ক্ষমতা থেকে সরাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কোম্পানির অর্থনৈতিক দাবি মেটাতে মির জাফর অপারগ ছিলেন। ফলে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মির জাফরকে সরিয়ে তার জামাই মির কাশিমকে কোম্পানি বাংলার নবাব পদে বহাল করে।

মির কাশিম ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক : বক্সারের যুদ্ধ

ব্রিটিশ কোম্পানির সহায়তায় নবাব পদ পাওয়ার ফলে প্রায় ২৯ লক্ষ টাকার সম্পদ কোম্পানির

রবার্ট ক্লাইভ মির কাশিম

আধিকারিকদের দিয়েছিলেন মির কাশিম। তাছাড়া বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারির অধিকারও মির কাশিম ব্রিটিশ কোম্পানিকে দিয়েছিলেন। ফলে গোড়ায় মির কাশিমকে নিজেদের বশংবদ হিসাবেই ভেবেছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। বাংলার রাজধানী হিসাবে মুর্শিদাবাদের বদলে মুঙ্গেরকে বেছে নিয়েছিলেন মির কাশিম। পাশাপাশি নবাবের পুরোনো সৈন্য বাহিনীকে

খারিজ করে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। এমনকি ক্ষমতাবান জগৎ শেঠদের থেকেও দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন মির কাশিম। তবে গোড়ায় ব্রিটিশ কোম্পানি মির কাশিমের পদক্ষেপগুলি নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিল না। ক্রমে ব্রিটিশ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে মির কাশিমের সঙ্গে কোম্পানির বিবাদ শুরু হয়।

কোম্পানির বণিকদের তরফে বেআইনি ব্যবসার ফলে বাংলার অর্থনীতি সমস্যার মুখে পড়েছিল। একদিকে কোম্পানি শুল্ক ফাঁকি দেওয়ায় নবাবের প্রাপ্য রাজস্বে ঘাটতি পড়েছিল। অন্যদিকে দেশীয় বণিকরা শুল্ক দিতে বাধ্য হওয়ায় অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছিল। তাছাড়া অন্যান্য বিদেশি বণিক গোষ্ঠীও ব্রিটিশ কোম্পানির

ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে নবাবের কাছে নালিশ জানাতে থাকে। শেষপর্যন্ত নবাব দেশীয় বণিকদের উপর থেকেও বাণিজ্য শুল্ক তুলে নেন। ফলে অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় বণিকরা রক্ষা পেলেও নবাবি কোশাগার অর্থসংকটের মুখে পড়ে।

টুকরো কথা

বক্সারের যুদ্ধ ও দেওয়ানি লাভ

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মির কাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির সরাসরি সংঘাত শুরু হয়। কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উদয়নালা এবং মুঙ্গেরের যুদ্ধে মির কাশিম কোম্পানির কাছে হেরে যান। শেষ অবধি বাংলা ছেড়ে অযোধ্যায় পালিয়ে যান মির কাশিম। কোম্পানি মির জাফরকে আবার

বাংলার নবাব হিসেবে বেছে নেয়। তবে অযোধ্যার শাসক সুজা উদ দৌলা ও দিল্লির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে নিয়ে মির কাশিম ব্রিটিশ-বিরোধী জোট গঠন করেন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঐ যৌথ বাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধকে বক্সারের যুদ্ধ বলা হয়। কোম্পানির বাহিনী যুদ্ধে জিতে যায়। মুঘল সম্রাট কোম্পানির সঙ্গে আপস রফা করেন। সুজা উদ-দৌলা ও মির কাশিম পালিয়ে যান।

পলাশির যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তারের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, বক্সারের যুদ্ধ জয়ে তা আরও সফল হয়। বাংলার উপর কোম্পানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য সুনিশ্চিত হয়েছিল।

তাছাড়া অযোধ্যার শাসকের পরাজয়ের ফলে প্রায় পুরো উত্তর ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। পাশাপাশি দিল্লির মুঘল সম্রাটকে হারিয়ে দেওয়ার ফলে আনুষ্ঠানিক মুঘল সার্বভৌমত্বও সমস্যার মুখে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার দিতে বাধ্য হন।

রবার্ট ক্লাইভকে দেওয়ানির সনদ দিচ্ছেন সম্রাট শাহ আলম। মূল ছবিটি বেঞ্জামিন ওয়েস্ট-এর আঁকা (আনু. ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ)

দেওয়ানির অধিকার ও দ্বৈত শাসন

বক্সারের যুদ্ধে ব্রিটিশ কোম্পানি জিতে যাওয়ার সম্ভবত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় লর্ড ক্লাইভ আবার বাংলায় ফিরে আসেন। ততদিনে মির জাফর মারা গিয়ে তাঁর ছেলে নজম উদ-দৌলা বাংলার নবাব হয়েছেন।

ক্লাইভ অবশ্য বক্সারের যুদ্ধ জয়ের সুবিধাকে ধীরে ধীরে বিস্তৃত করতে উৎসাহী ছিলেন। ফলে বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত উত্তর ভারতের ক্ষমতা সরাসরি দখল না করে মুঘল সম্রাটের প্রতি মৌখিক আনুগত্য জানায় কোম্পানি। সেইমতো

দ্বিতীয় শাহ আলম ও সুজা উদ-দৌলার সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানি দুটি চুক্তি করতে উদ্যোগী হয়। সেই মোতাবেক ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে দুটি চুক্তি হয়। ঐ চুক্তিগুলি অনুসারে কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার বিনিময়ে সুজা উদ-দৌলা অযোধ্যার শাসনভার ফিরে পান। কেবল কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল অযোধ্যা থেকে আলাদা করে মুঘল বাদশাহের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাদশাহ শাহ আলম দিল্লির অধিকার ফিরে পাওয়ার বদলে একটি ফরমান জারি করেন। সেই ফরমান অনুযায়ী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার ব্রিটিশ কোম্পানিকে দেওয়া হয়। তার বদলে কোম্পানি শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করে।

টুকরো কথা

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা

দেওয়ানির অধিকার পাওয়ার ফলে দ্রুতই ভারতবর্ষে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছিল। মির কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোম্পানির অনেক টাকা খরচ হয়েছিল। দেওয়ানির অধিকার থেকে সেই টাকা ফেরত পাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল কোম্পানি। তাছাড়া সুবা বাংলার রাজস্ব আদায় করার আইনি অধিকার ব্রিটিশ কোম্পানিকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী করে তুলেছিল। কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলায় এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র কায়েম হয়। বাস্তবে বাংলায় দুজন শাসক তৈরি হয়। একদিকে রাজনৈতিক ও নিজামতের দায়িত্ব

ছিল বাংলার নবাবের হাতে। যাবতীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রয়ে গিয়েছিল নবাব নজম উদ-দৌলার উপর। অন্যদিকে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেয়েছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। ফলে নবাবের হাতে ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দায়িত্ব। ব্রিটিশ কোম্পানি পেয়েছিল দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক ক্ষমতা। বাংলার এই শাসন ব্যবস্থাকে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (Dual system of administration) বলা হয়।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বিদেশি শক্তি। সেই প্রথম কোনো বিদেশি বণিক কোম্পানির হাতে একটি সুবার দেওয়ানির অধিকার ন্যস্ত হয়েছিল। ক্রমে দেখা যায় নিজেদের বাণিজ্য চালানোর প্রয়োজনে ব্রিটিশ কোম্পানির

ব্রিটেন থেকে মূলধন নিয়ে আসার পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। বাংলার রাজস্বই কোম্পানির ব্যবসায় লগ্নি করা হয়। বস্তুত ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার প্রধান শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। তার ফলে ধীরে ধীরে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ভিত তৈরি হয়েছিল। 'বণিকের মানদণ্ড' ক্রমে 'রাজদণ্ডে' পরিণত হয়েছিল।

টুকরো কথা

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় দ্বৈতশাসন চলেছিল। এই সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব

রাজস্ব আদায় করা। এর ফলে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বঙ্গাব্দের হিসাবে বছরটা ছিল ১১৭৬ বঙ্গাব্দ। তাই সাধারণভাবে ঐ দুর্ভিক্ষকে '৭৬-এর মন্বন্তর বলা হয়।

"ইংরেজেরা বাণিজ্যলোভে প্রজাসাধারণকে পদদলিত করিতে লাগিলেন ; .... কিন্তু হায়। প্রজার রোদনে কেহই কর্ণপাত করিলেন না! জমীদারদল মান সম্ভ্রম এবং জমীদারী-রক্ষার জন্য ইংরেজের করুণাকটাক্ষের আশায়, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করিতে লাগিলে;....।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যে সকল কৃষকসন্তান আশা ও উৎসাহের সহিত গ্রাম্য সঙ্গীত গান করিতে করিতে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে হলকর্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিল, ---উপযুক্ত বর্ষণাভাবে, সুসময়ে

জলসেচ না পাইয়া, শীঘ্রই তাহাদের আশা ও উৎসাহ উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল। হৈমন্তিক ধান্য নষ্ট হইয়া গেল, অগ্নিমূল্য সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে লাগিল।.... এক বৎসর নিরাশ হইয়া পর বৎসরের ফসলের আশায় আবার কৃষককুল হলকর্ষণ করিল; কিন্তু আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বৎসর চলিয়া গেল ;—১৭৬৯ খৃষ্টাব্দেও শস্যের আশা নির্ম্মূল হইল।

.....

... যখন কালের চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন.... ইংরাজ সেনার অন্ন সংস্থানের জন্য ছলে বলে কৌশলে যথাসাধ্য চাউল ধান গোলাজাত করিয়া, পুনরায় নিপুণহস্তে রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন!

.....

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের সূচনা হইতেই চারি দিকে কালের চিতা জ্বলিয়া উঠিল;— অন্নাভাবের সঙ্গে মহামারী মিলিত হইয়া গ্রাম নগর উৎসন্ন করিতে আরম্ভ করিল! দেশময় মহামন্বন্তর জাগিয়া উঠিলে, এই সকল শ্বেতাঙ্গ সওদাগর-গোষ্ঠীর পক্ষে রাতারাতি বড়মানুষ হইবার সহজ পথ আবিষ্কৃত হইল। .... দুর্ভিক্ষের গতিরোধ করিবার জন্য কোনরূপ আয়োজন করা দূরে থাকুক, বরং দুর্ভিক্ষ যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহাই ইহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

.....

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের নিদারুণ গ্রীষ্মকালে শত শত লোকে কালকবলে পতিত হইতে আরম্ভ করিল। কৃষকেরা গোমহিষাদি বিক্রয় করিল, কৃষিযন্ত্রাদি হস্তান্তরিত করিল, বীজধান্য

পর্যন্তও দুর্ভিক্ষে দগ্ধ হইয়া গেল;—অবশেষে তাহারা পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল! কিন্তু হায়! অল্পদিনের মধ্যেই ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইল!

.....

১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বিলাতের ডিরেক্টারগণ লিখিয়া পাঠাইলেন যে:

যাঁহারা কিয়ৎপরিমাণেও মন্বন্তরের গতিরোধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু যাঁহারা এরূপ বিপদের দিনেও পরপীড়ন করিয়া অর্থোপার্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম।....

হেস্টিংস আসিয়া যখন মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন.... তিনি লিখিলেন যে: এত বড়

মহামন্বন্তরেও রাজস্বসংগ্রহে কিছুমাত্র শিথিলতা করা হয় নাই! এক-তৃতীয়াংশ কৃষক জীবন বিসর্জন করিয়াছে, কৃষিকার্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু তথাপি দুর্ভিক্ষশেষে পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ-প্রতাপে রাজকর সংগৃহীত হইতেছে! যে সকল কারণে সর্বনাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাও একটি প্রধান কারণ বলিতে হইবে।

[উদ্ধৃত অংশগুলি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র 'মন্বন্তর' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে (মূল বানান অপরিবর্তিত)।]

দুর্ভিক্ষ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের বাংলার মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে)

কোম্পানি - শাসনের বিস্তার : ব্রিটিশ রেসিডেন্স ব্যবস্থা

ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক অঞ্চলেই ব্রিটিশ কোম্পানি ‘পরোক্ষ শাসন’ চালাত। নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রাজদরবারে নিজেদের প্রতিনিধি রাখত কোম্পানি। সেই প্রতিনিধিরা রেসিডেন্ট নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ব্যবস্থা একটি নতুন ব্যবস্থা ছিল। এর মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ কোম্পানির চূড়ান্ত ক্ষমতা রূপ পেয়েছিল। কোম্পানির নজর এড়িয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা ভারতীয় রাজশক্তিগুলির

নিজে করো

৩২ পৃষ্ঠার মানচিত্রটির মতো একটি মানচিত্র আঁকো। তাতে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার চিহ্নিত করো।

বিশেষ ছিল না। কোম্পানির হয়ে সেই নজরদারির কাজটাই চালাত স্থানীয় ব্রিটিশ রেসিডেন্ট।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের পরে কোম্পানি বাংলা, অযোধ্যা ও হায়দরাবাদের রাজদরবারে নিজেদের প্রতিনিধি বা রেসিডেন্ট নিয়োগ করে। তবে সেইসময়ে রেসিডেন্টরা নিজেদের কাজকর্ম বিষয়ে সংযত থাকতেন।

লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে রেসিডেন্টরা সাবধানতার বদলে আগ্রাসী নীতি নিয়েছিলেন। ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অনেক সময় রেসিডেন্টরা কোম্পানিকে সরাসরি এলাকা দখলের জন্য উসকে দিতে থাকে। তবে

লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে আসার পর সাময়িকভাবে রেসিডেন্সি ব্যবস্থার আগ্রাসন থমকে যায়। কিন্তু কর্নওয়ালিস মারা যাওয়ার পরে নতুন করে কোম্পানি এলাকা দখলের কাজে উদ্যোগী হয়।

লর্ড ওয়েলেসলি লর্ড ডালহৌসি

পরোক্ষ শাসন কায়েমের বদলে বিভিন্ন এলাকাকে সরাসরি কোম্পানির অধীন এলাকা হিসেবে দখল

করে নেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়। লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব বিলোপ নীতি সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

দেশীয় রাজ্য দখলের উদ্যোগ : অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতি

ভারতীয় উপমহাদেশে কোম্পানির শাসন বিস্তার প্রক্রিয়ায় অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি কখনও স্বেচ্ছায় কখনও বা যুদ্ধে হেরে যাওয়ার ফলে ঐ নীতি দুটির আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল। একদিকে হায়দরাবাদের নিজাম স্বেচ্ছায় অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি মেনে

নিয়েছিলেন। অন্যদিকে মহীশূরের শাসক টিপু সুলতান ঐ নীতির বিরোধিতা করার জন্য কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া মারাঠা, শিখ ও অন্যান্য বিভিন্ন রাজশক্তিগুলিও নানাভাবে ঐ আগ্রাসী নীতিদুটির মুখে পড়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের রাজশক্তিগুলির মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব চলত। প্রত্যেকেই নিজের শাসন এলাকা ও সম্পদ বাড়াবার উদ্যোগ নিত। ফলে পারস্পরিক সংঘাত ছিল অনিবার্য। ব্রিটিশ কোম্পানিকেও একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখত রাজশক্তিগুলি। ফলে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বদলে রাজশক্তিগুলির অনেকেই কোম্পানির সঙ্গে জোট বাঁধত। দেশীয় রাজশক্তিগুলির

অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানি নিজের বাণিজ্যিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছিল। তাই ক্রমেই আঞ্চলিক রাজনীতির ব্যাপারে ব্রিটিশ কোম্পানি ভূমিকা নিতে শুরু করে। তাছাড়া রাজনৈতিক অশান্তি কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্যের পথেও বাধা ছিল। অতএব রাজ্যগুলির দলাদলির সুযোগে কোম্পানি সেগুলি দখল করার চেষ্টা করত।

ব্রিটিশ কোম্পানির আগ্রাসী নীতির অন্যতম রূপ ছিল অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি। লর্ড ওয়েলেসলি ঐ নীতি প্রয়োগ করে দেশীয় বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের আঞ্চলিক শক্তিগুলির বিবাদজনিত অশান্তিকে ওয়েলেসলি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপদ হিসেবে তুলে ধরতেন।

তারপর সরাসরি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশীয় শক্তিগুলিকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিতে বাধ্য করতেন।

অষ্টাদশ শতকে হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের নেতৃত্বে মহীশূর রাজ্য দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছিল। মহীশূরের সেনাবাহিনী ইউরোপীয় কায়দায় গড়ে তোলা হয়েছিল। মহীশূরের আঞ্চলিক বিস্তার ও অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে হায়দর ও টিপুর সংঘাত হয়েছিল। ঐ দ্বন্দ্বে ক্রমেই ব্রিটিশ কোম্পানি নাক গলাতে থাকে। ফলে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে মহীশূরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ে উদ্যোগী হয় ব্রিটিশ কোম্পানি।

১৭৬৭ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চারটি যুদ্ধ হয় কোম্পানি ও মহীশূরের মধ্যে। সেগুলিকে ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ বলা হয়। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের মাধ্যমে লর্ড ওয়েলেসলি মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত করেন। রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষা করতে গিয়ে টিপু সুলতান মারা যান। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগ করে মহীশূরের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। মহীশূর রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে সরাসরি কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কোম্পানির সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় মহীশূরে। হায়দরাবাদকে মহীশূরের কিছু অংশ দিয়ে দেওয়া হয়।

জোসেফ দুপ্লে

টুকরো কথা

ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব

ভারতে উপনিবেশ গড়ে তোলা আর বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে ফরাসিদের স্বার্থের সংঘাত চলেছিল প্রায় ২০ বছর ধরে। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যের এই সংঘাত মূলত দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। করমণ্ডল উপকূল ও তার পশ্চাদভূমিকে ইউরোপীয়রা কর্ণাটিক নাম দিয়েছিল। এই অঞ্চলই ছিল তিনটি ইঙ্গ- ফরাসি যুদ্ধের মূল কেন্দ্র। ভারতে ফরাসিদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল চন্দননগর ও পণ্ডিচেরি। এই সময় পণ্ডিচেরির ফরাসি গভর্নর জেনারেল দুপ্লে স্থানীয় রাজা, নবাব ও অঞ্চল প্রধানদের সেনাবাহিনী ও সম্পদ ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বন্দিবাসে (তৃতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধে) ফরাসিদের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। এই পরাজয়ের ফলে ভারতে ব্রিটিশদের ক্ষমতা বিস্তারের পথে আর কোনো ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।

দাক্ষিণাত্যে তখন মারাঠা জোটের আধিপত্য বজায় ছিল। পেশোয়া পদের অধিকার নিয়ে মারাঠা জোটের মধ্যে বিবাদ বাধে। রঘুনাথ রাও পেশোয়া নারায়ণ রাওকে হত্যা করেন। তখন মারাঠা সর্দারেরা রঘুনাথ রাওয়ের বিরুদ্ধে একজোট হয়। রঘুনাথ রাও ব্রিটিশদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকে ব্রিটিশ-বাহিনী রঘুনাথ রাওয়ের সাহায্যের জন্য যায়। ক্রমে মারাঠা জোটের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির সংঘাত তৈরি হয়। যদিও ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে সলবাইয়ের চুক্তিতে কোম্পানির সঙ্গে মারাঠাদের সম্পর্ক ভালো হয়ে যায়। কোম্পানি-বিরোধী শক্তিশালী জোট ভেঙে যায়। পেশোয়া পদ নিয়ে অবশ্য মারাঠা সর্দারদের দ্বন্দ্ব

চলতেই থাকে। সেই সুযোগে লর্ড ওয়েলেসলি মারাঠা শক্তির সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের উদ্যোগ নেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওকে বেসিনের সন্ধির মাধ্যমে অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিতে সই করিয়ে নেয়। পেশোয়ার দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বসানো হয়। কোম্পানির সমর্থন নিয়ে দ্বিতীয় বাজিরাও শাসন চালাতে থাকেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জায়গায় মারাঠাদের সঙ্গে কোম্পানির লড়াই অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও বিভিন্ন মারাঠা গোষ্ঠীকে একজোট করে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে (১৮১৭-১৯ খ্রিস্টাব্দ) কোম্পানির মুখোমুখি হন। সেই যুদ্ধে মারাঠা বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কোম্পানি পেশোয়ার সমস্ত এলাকার দখল নেয়। পেশোয়া পদ বিলুপ্ত

করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন মারাঠা শক্তি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নেয়। দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার চূড়ান্ত রূপ পায়।

উত্তর ভারতে অযোধ্যা ও পঞ্জাব কোম্পানির আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়েছিল। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যায় কোম্পানির প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া কোম্পানির স্থায়ী সেনাবাহিনী অযোধ্যায় মোতায়েন করা হয়েছিল। পাশাপাশি অযোধ্যার উত্তরাধিকারী নিয়ে গোলযোগ তৈরি হয়। সেইসব পরিস্থিতির সুযোগে অযোধ্যার প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করে কোম্পানি বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয়।

উত্তর ভারতে পঞ্জাবে শিখ শক্তির মোকাবিলা করাই কোম্পানির পক্ষে বাকি ছিল। শিখদের

মধ্যেও উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব পাকিয়ে ওঠে। রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে উত্তর ভারতের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে 'অশান্ত' পরিস্থিতিকে শান্ত করার দোহাই দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি পঞ্জাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে শিখ-বাহিনী হেরে যায়। লাহোরের চুক্তি (১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ) অনুযায়ী

টিপু সুলতানের পরাজয়। মূল ছবিটি হেনরি সিঙ্গলটন-এর আঁকা (আনু. ১৮০০খ্রিস্টাব্দ)

জলন্ধর দোয়াবে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। শিখ দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে কোম্পানির পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল। ঐ নীতির প্রয়োগ কর্তা লর্ড ডালহৌসির আমলে (১৮৪৮-৫৬ খ্রিস্টাব্দ)

পেশোয়া-র দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ও মারাঠা নেতৃত্বের চুক্তি (১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ)। মূল ছবিটি থমাস দানিয়েল-এর আঁকা।

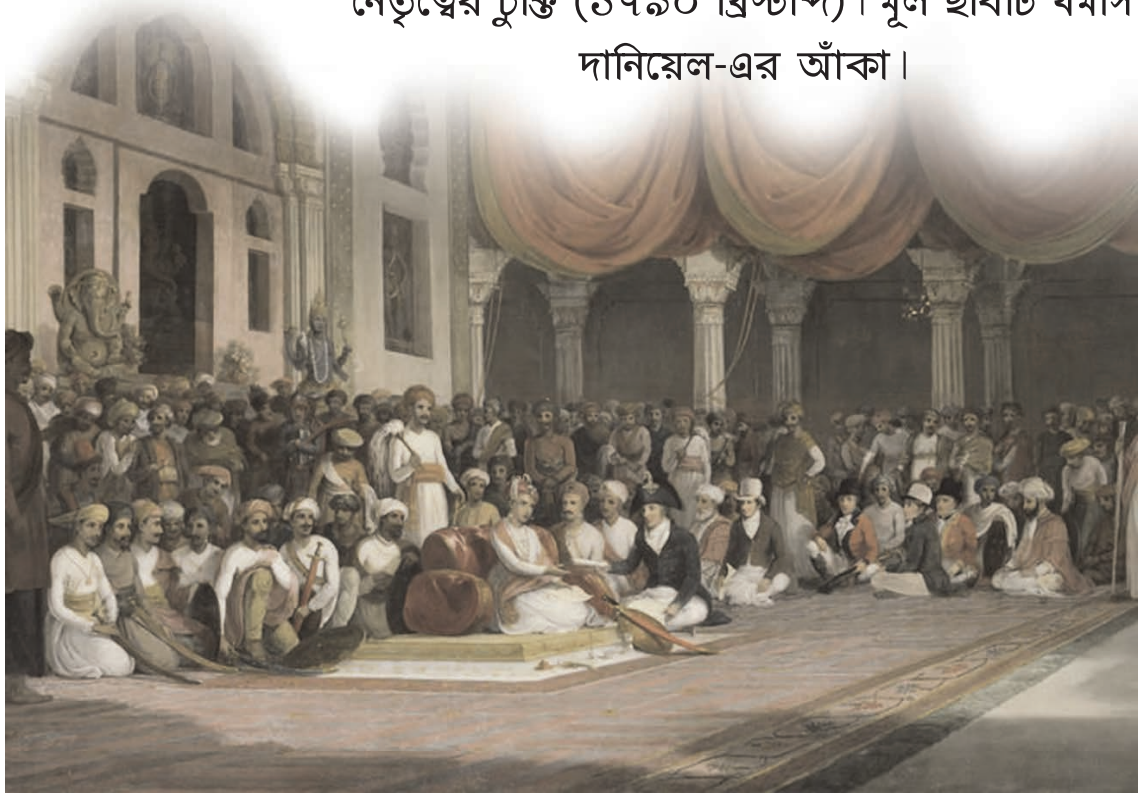

কোম্পানির আগ্রাসী রূপ প্রকট হয়েছিল। যেসব ভারতীয় শাসকদের কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকত না, তাদের শাসন এলাকা কোম্পানির হস্তগত হয়ে যেত। সেভাবেই ডালহৌসি সাতারা, সম্বলপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে নেন। কোম্পানির সেনাবাহিনীর খরচ মেটানোর জন্য হায়দরাবাদের বেরার প্রদেশ ছিনিয়ে নেন ডালহৌসি। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অপশাসনের অভিযোগে অযোধ্যার বাকি অংশ কোম্পানির দখলে নিয়ে আসেন তিনি। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে জেতার ফলে পঞ্জাবও ক্রমে কোম্পানির অধিকারে চলে যায়। এইভাবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লর্ড ডালহৌসির নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশের ষাটভাগেরও বেশি অঞ্চলে ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি (আনুমানিক ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)
উত্তর
অমৃতসর
লাহোর
পানিপত
দিল্লি
আগ্রা
গোয়ালিয়র
লখনৌ
এলাহাবাদ
বেনারস
পাটনা
মুর্শিদাবাদ
ঢাকা
কলকাতা
আহমেদাবাদ
বরোদা ইন্দোর
নাগপুর
সুরাট
ঔরঙ্গাবাদ
বোম্বাই
পুনা
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
গোয়া
মসুলিপত্তনম
শ্রীরঙ্গপত্তম
মহীশূর
মারাঠা-অধীন অঞ্চল
নিজাম-এর অঞ্চল
ব্রিটিশ-অধীন অঞ্চল
মহীশূর অঞ্চল
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
অযোধ্যা	প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ	সাদাৎ খান
স্বত্ববিলোপ নীতি	বক্সারের যুদ্ধ
লাহোরের চুক্তি	মহীশূর
টিপু সুলতান	লর্ড ডালহৌসি

২। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক) ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন বাংলার--- (দেওয়ান /ফৌজদার/ নবাব)।

খ) আহমদ শাহ আবদালি ছিলেন— (মারাঠা/ আফগান/ পারসিক)।

গ) আলিনগরের সন্ধি হয়েছিল— (মির জাফর ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে/সিরাজ ও ব্রিটিশকোম্পানির মধ্যে/মির কাশিম ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে)।

ঘ) ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার দেন— (সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম/সম্রাট ফাররুখশিয়র/সম্রাট ঔরঙ্গজেব)।

ঙ) স্বেচ্ছায় অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি মেনে নিয়েছিলেন— (টিপু সুলতান/সাদাৎ খান/ নিজাম)।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০টি শব্দ) :

ক) ফাররুখশিয়রের ফরমানের গুরুত্ব কি ছিল?

খ) কে, কীভাবে ও কবে হায়দরাবাদে আঞ্চলিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

গ) 'পলাশির লুণ্ঠন' কাকে বলে?

ঘ) দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো?

ঙ) ব্রিটিশ রেসিডেন্টদের কাজ কী ছিল?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০টি শব্দ) :

ক) অষ্টাদশ শতকে ভারতে প্রধান আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থানের পিছনে মুঘল সম্রাটদের ব্যক্তিগত অযোগ্যতাই কেবল দায়ী ছিল? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

খ) পলাশির যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের মধ্যে কোনটি ব্রিটিশ কোম্পানির ভারতে ক্ষমতা বিস্তারের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

গ) মির কাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধের ক্ষেত্রে কোম্পানির বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসার কী ভুমিকা ছিল? বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাব কী হয়েছিল?

ঘ) ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি থেকে স্বত্ববিলোপ নীতিতে বির্বতনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

ঙ) মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দি খান-এর সময়ে বাংলার সঙ্গে মুঘল শাসনের সম্পর্কের চরিত্র কেমন ছিল?

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ টি শব্দের মধ্যে) :

ক) ধরো তুমি নবাব আলিবর্দি খান-এর আমলে বাংলার একজন সাধারণ মানুষ তোমার এলাকায় বর্গি আক্রমণ হয়েছিলো। তোমার ও তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে বর্গিহানার অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটি কথোপকথন লেখো।

খ) ধরো তুমি ব্রিটিশ কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি। '৭৬-এর মন্বন্তর-এর সময় তুমি বাংলায় ঘুরলে তোমার কী ধরনের অভিজ্ঞতা হবে? মন্বন্তরের সময়ে মানুষকে সাহায্যের জন্য কোম্পানিকে কী কী করতে পরামর্শ দেবে তুমি?